[illegible]

(evsjv-bengali-البنغالية)

[illegible]

[illegible]: [illegible]

1431هـ - 2010م

islamhouse.com

حق الأجير من منظور شرعي

(باللغة البنغالية)

محمد عبد الرحيم

مراجعة : عبد الله شهيد عبد الرحمن

2010 - 1431

islamhouse.com

ইসলামী সমাজে মজুরের অধিকার

* মালিকানা সমস্যা ও ইসলাম: মালিকানা সম্পর্কে দুইটি মত
* অস্বাভাবিক মালিকানা নীতির পরিণাম
* সম্পত্তির জাতীয়করণ
* মালিকানা স্বত্ব ও ইসলাম
* পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজে মজুরদের অবস্থা
* ইসলামে মজুরদের অধিকার
* ইসলামী সমাজে মজুরদের মর্যাদা ও অধিকার
* নবতর শ্রমিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও ভিত্তি
* বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলন
* শ্রমের উদ্বোধক
* স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা

পূর্বকথা

শ্রমিক-মালিক মানব সমাজের এক সুপ্রাচীন সমস্যা। যুগ যুগ ধরিয়া এই সমস্যাটি মানব সমাজকে নানাভাবে আলোড়িত করিয়াছে, অনাকাক্ষিতভাবে মেহনতী মানুষের রক্ত ঝরাইয়াছে। এমনকি, শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে ভারসাম্য রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) নামে একটি বিশ্বসংস্থা পর্যন্ত গঠন করা হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও শ্রমিক-মালিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান নিশ্চিত হইয়াছে, একথা কোনক্রমেই দাবি করা চলে না। বরং এখনও দেশে দেশে শ্রমিক-মালিক সমস্যা একটি প্রকট সমস্যা রূপে বিরাজ করিতেছে, শ্রমজীবি মানুষের রক্তে অহরহ রাজপথ রঞ্জিত হইতেছে। বলাবাহুল্য যে, বাংলাদেশেও কম-বেশি একই পরিস্থিতি বিরাজ করিতেছে।

মূলত শ্রমিক-মালিক সমস্যাটিকে অধূনা বিবেচনা করা হইতেছে নেহায়েত একটি শ্রেণীগত সমস্যা হিসাবে। এখানে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে না। ফলে শ্রমিক-মালিক উভয় পক্ষই বিষয়টিকে বিবেচনা করিতেছে নেহায়েত শ্রেণীস্বার্থের দৃষ্টিতে। কিন্তু আল্লাহর মনোনীত জীবন-বিধান ইসলাম সমগ্র বিষয়টিকে বিবেচনা করিয়াছে মানবিক ও ন্যায়নুগ দৃষ্টিতে। শ্রমিক ও মালিক কোন পক্ষকেই সে বড় কিংবা ছোট করিয়া দেখে নাই; বরং উভয় পক্ষের স্বার্থকেই সে রক্ষা করিয়াছে পরিপূর্ণ ন্যায়পরতার দৃষ্টিতে। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, আলেম ও দার্শনিক

মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রহ) এই বিষয়টিকেই অত্যন্ত চমৎকার রূপে তুলিয়া ধরিয়াছেন ইসলামী সমাজে মজুরের অধিকার নামক বর্তমান পুস্তিকায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই পুস্তিকাটি রচিত হইয়াছে দীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে। তৎকালীন দুনিয়ার সামাজিক রাজনৈতিক ও অথনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে। তারপর দুনিয়ার উপর দিয়া অনেক পানি গড়াইয়া গিয়াছে; কমিউনিস্ট বিশ্বের মানচিত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। উপমহাদেশে পাকিস্তান ভাঙিয়া বাংলাদেশ হইয়াছে। ইহার ফলে দুনিয়ার শ্রমিক আন্দোলনেও কিছু কিছু পরিবর্তনের ছাপ পড়িয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বর্তমান শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তেমন কোন পরিবর্তন সূচিত হয় নাই। এই কারণেই বর্তমান পুস্তিকার সংশ্লিষ্ট অংশে আমরা কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন বোধ করি নাই।

পুস্তিকার নিবন্ধসমূহ প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল পঞ্চাশের দশকের প্রথম ভাগে তৎকালীন দৈনিক আজাদসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং প্রায় একই সময়ে তাহা পুস্তকাকারেও আত্মপ্রকাশ করে। বিগত বৎসরগুলিতে ইহার অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং পাঠক সমাজেও তাহা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। পুস্তকটির বর্তমান সংস্করণও পাঠকদের নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত হইবে বলিয়া আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

মহান আল্লাহ পুস্তকটির লেখককে যথোচিত প্রতিফল দান করুন, ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা
মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
চেয়ারম্যান
মওলানা আবদুর রহীম ফাউন্ডেশন
ঢাকা, ২৫ জানুয়ারি, ২০০৩

মালিকানা সমস্যা ও ইসলাম: মালিকানা সম্পর্কে দুইটি মত

অর্থ ও সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। একটি ব্যক্তিগত মালিকানা এবং অপরটি সম্পত্তির জাতীয়করণ। ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার ব্যক্তিকে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা দান করিয়াছে। যে কোন উপায়ে হউক না কেন, সে যত সম্পদ এবং যত সম্পত্তিই উপার্জন করিবে, তাহাকে সে একান্তভাবে নিজের মালিকানাধীন মনে করিতে পারিবে। উপার্জনের এই নিরংকুশ স্বাধীনতা

ব্যয়ের ব্যাপারেও তাহাকে পূর্ণ নিরংকুশ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তোলে। কাজেই তাহার উপার্জিত অর্থ ও সম্পত্তি যেভাবে যে পথে এবং যত পরিমাণেই সে ইচ্ছা করিবে, অনায়াসেই তাহা খরচ করিতে পারিবে; কিংবা এক বিন্দু খরচ না করিয়া তিল-তিল করিয়া তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিলেও তাহাতে কাহারো আপত্তি করা চলিবে না। এক কথায়, ব্যয় করা বা সঞ্চয় করিবার ব্যাপারে এই মত ব্যক্তিকে পূর্ণ আজাদী দান করিয়াছে। বস্তুত ইহাকেই বলে ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার। বর্তমান যুগের পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের নিশানবর্দারগণ এই মত সমর্থন করিয়া থাকে। আর সত্য বলিতে কি, অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গির মারাত্মক পরিণতি দীর্ঘকাল ধরিয়া সমগ্র দুনিয়াকে শোষিত নিষ্পোষিত এবং দু:খ ও দারিদ্রের দু:সহ জ্বালায় জর্জরিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহা মানুষকে অমানুষিক স্বার্থপরতা ও নির্মম অর্থপূজা শিক্ষা দিয়াছে। এই ব্যবস্থা পুঁজিপতি ও সম্পদশালীদের স্বাতন্ত্র্যবাদ ও শ্রেষ্ঠত্ববোধে দীক্ষিত করিয়া বিশাল বিশ্ব-মানবতার ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছে। দু:খিতের আহাজারী আর ব্যথিতের মর্মবিদারী ফরিয়াদ তাহাদের কর্ণকুহরে মাত্রই পৌঁছায় না। বিপন্ন ও ব্যথিত মানুষ যখন তাহাদের সম্মুখে এক বিন্দু করুণা লাভের আশায় হস্ত প্রসারিত করিয়া সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবার জন্য করুণ নেত্রে তাহাদের প্রতি তাকায়, তখন তাহারা ইহাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করিতে বিন্দুমাত্র কুন্ঠাবোধ করে না। এই সব দরিদ্র, সর্বহারা ও মজলুম মানুষকে তাহারা হীন, নীচ ও মানবতার কুলাংগার বলিয়া মনে করে। অন্য কথায়, দরিদ্র আর সর্বহারা হইয়া যেন তাহারা মস্তবড় অপরাধ করিয়া বসিয়াছে। এই ধরনের লোক যখন কোন কারখানার মালিক হইয়া বসে, তখন মজুর-শ্রমিকদিগকে তাহাদের শোষণ ও নিষ্পেষণের অগ্নিজ্বালায় ভষ্ম করিতে থাকে। আবার ইহারা যখন জমিদার ও জোতদার হইয়া বসে, তখন প্রজা-কৃষকগণ তাহাদের নিকট নিরন্তর লাঞ্চিত ও নিপীড়িত হইতে থাকে। আর রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব যখন ইহারা লাভ করে, তখন নিন্মশ্রেণীর সরকারী কর্মচারী হইতে শুরু করিয়া দেশের কোটি কোটি বাসিন্দা খাদ্য-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি মানুষের বুনিয়াদী প্রয়োজন হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়া যায় এবং তাহাদের বঞ্চিত রেখে বিপুল জাতীয় সম্পদকে ইহারা ইহারা নিজেদের বিলাস-ব্যাসন, লোভ ও লালসা এবং নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের অগ্নি শিখায় আহুতি দেয়।

অস্বাভাবিক মালিকানা নীতির পরিণাম

বস্তুত ব্যক্তিগত মালিকানার এই অস্বাভাবিক নীতির এটাই মারাত্মক পরিণতি। এই নীতি আজ দুনিয়ার সকল পুঁজিবাদী দেশে প্রচন্ড রূপ ধারণ করিয়াছে। কারণ মানুষ যখন নিজেকে কোন জিনিসের নিরুংকুশ, প্রকৃত একক মালিক এবং সর্বময় স্বত্বাধিকারী বলিয়া মনে করিতে থাকে, তখন তাহার সংকীর্ণ দৃষ্টি ও স্বাভাবগত মূর্খতা তাহাকে কৃপণ, লোভী ও অর্থভোগী করিয়া তোলে। বর্তমানে দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী ধর্মহীন গণতন্ত্রের ইহার বাস্তব নিদর্শন সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজতন্ত্র, একনায়কত্ববাদ আর সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার বুকে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র অপেক্ষাও মারাত্মক ধ্বংসলীলার সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, রাজা বা সম্রাট নিজেকে তাহার বিশাল রাজ্য বা সাম্রাজ্যের এবং সমগ্র উপায়-উপাদানের একমাত্র ও প্রকৃত মালিক বলিয়া মনে করিয়াছে। ফলে দেশে যাবতীয় ধন-সম্পদ ও উপায়-উপাদানকে কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিস্বার্থের কাজে ব্যয় করিয়াছে। আর কোটি কোটি জনগণের স্বার্থ, প্রয়োজন এবং কল্যাণসাধনকে সে একেবারেই উপেক্ষা করিয়াছে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রে যারা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব লাভ করে, তাহারা মনে করে যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তত্ব প্রকৃতপক্ষে তাহাদের নিজস্ব নয়, বরং দেশের জনগণই প্রকৃত কর্তৃত্বের মালিক-তাহাদের নিকট এই কর্তৃত্ব আমানত স্বরূপ অর্পণ করা হইয়াছে মাত্র। এই মনোভাবের কারণই গণতন্ত্রের অধীন মানুষ রাজতন্ত্র, একনায়কত্ববাদ বা সামাজ্রবাদ অপেক্ষা অধিকতর শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু জনগণের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের একচ্ছত্র মালিক হওয়ার ধারণাটাও মূলত ভুল এবং অচিরে তাও মারাত্মক আকার ধারণ করিয়া বসে। রাজতন্ত্র, একনায়কত্ববাদ ও সাম্রাজ্যবাদ এক ব্যক্তির মধ্যে যে সংকীর্ণ দৃষ্টি ও স্বার্থপরতার সৃষ্টি করে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ঠিক তা-ই জাগিয়ে তোলে সমগ্র জাতির মধ্যে এবং ইহার পরিণাম অন্তহীন যুদ্ধ ও সংঘাত ব্যতীত আর কিছুই হয় না।

মোটকথা, ইহা অনস্বীকার্য যে, ব্যক্তিগত মালিকানা-অন্যকথায় ব্যক্তির স্ব-উপার্জিত ধন-সম্পত্তির উপর তাহার নিরংকুশ মালিক হওয়া এক ভয়ানক মারাত্মক ব্যবস্থা, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। ধন-সম্পত্তি সম্পর্কে

এহেন বুনিয়াদী ধারণাই বর্তমান ধন-তন্ত্র, পুঁজিপতির ও জমিদারীর মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক রূপ ধারণ করিবার মূলীভূত কারণ।

সম্পত্তির জাতীয়করণ

ব্যক্তিগত মালিকানার পরে দ্বিতীয় মত হচ্ছে জাতীয় মালিকানা। ইহার অর্থ এই যে, দেশের কোন জিনিসের মালিক হইবে না; বরং দেশের ও জাতির যাবতীয় ধন-সম্পত্তির মালিক হইবে নির্বিশেষে ও সম্মিলিতভাবে দেশের সমগ্র জাতি। সাধারণভাবে কমিউনিজম ও মার্কসবাদের ধ্বজাধারিগণই এ মত পোষণ ও প্রচার করিয়া থাকে। এই মতের দৃষ্টিতে সমাজক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তার কোনই গুরুত্ব নাই, সকল গুরুত্ব এবং সর্বময় কর্তৃত্ব একান্তভাবে সমাজের হাতে ন্যস্ত করা হয়। ব্যক্তি সেখানে খাটে, মেহনত করিয়া উপার্জন করে, কিন্তু উপার্জিত সম্পদের মালিক সে ইইতে পারে না, সমাজ তাহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখিয়া নিজেই একচ্ছত্র মালিক হইয়া বসে। ব্যক্তি তাহার মেহনত, যোগ্যতা ও মননশক্তি ব্যয় করিয়া তাহার বিনিময়ে সমাজের নিকট হইতে পেটভরা খাবার, পরিধানের বস্ত্র আর সম্ভব হইলে বাসস্থান লাভ করে। ফলত সে সমাজের চাকর, এই চাকরী হইতে সে মৃত্যু পর্যন্ত কখনও মুক্তি পাইতে পারে না। উপরোন্ত তাহার এই নিরংকুশ ও একচ্ছত্র মনিব ও প্রভূ তাহাকে এতটুকু সুযোগ দেয় না যে, সে নিজের দাবি অনুযায়ী নিজের পরিশ্রমের সঠিক মূল্য আদায় করিতে চেষ্টা করিবে।

ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থার অধীন প্রতিটি শ্রমিক মজুর নিজের শ্রম-মেহনত বিক্রয় করিয়া পুঁজিদারের নিকট উপযুক্ত মূল্য সে অনায়াসেই দাবি করিতে পারে, সে সুযোগ তাহাতে পূর্ণরূপে লাভ করা যায়। এমনকি একজন পুঁজিদার তাহার দাবি অনুসারে মূল্য দিতে প্রস্তুত না হইলে সে অন্যত্র তাহার ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে। কিন্তু শ্রেণীহীন সমাজ তথা এই জাতীয় মালিকানা ব্যবস্থায় সমাজ মজুর শ্রেণীর শ্রম-মেহনতের মূল্য যা-ইচ্ছা তা-ই নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে, সে সম্পর্কে মজুরের কোন কিছু বলিবার অধিকার মাত্রই নাই। এবং সমাজ কর্তৃক কোন মূল্যবান নির্দিষ্ট হইয়া গেলে তাহার প্রতিবাদ করিবার বা তাহার বিরুদ্ধে একক কিংবা সংঘবদ্ধ আওয়াজ বুলন্দ করিবার কোন সুযোগই সে পাইতে পারে না। এমনকি এই অত্যাচারী ও শোষক মনিবের দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইবার জন্য অন্য কোথায়াও ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখতেও সে সক্ষম

হয় না। কেননা এখানে সে জন্মগত মজুর, সমাজ তাহার স্বাভাবিক প্রভূ। পরিশ্রমের মূল্য সে যা ইচ্ছা বাঁধিয়া দিতে পারে, কিংবা একেবারে না দিবার সিদ্ধান্ত করিলেও তাহার প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়-মজুর তাহার গোলামী হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না।

সমাজবাদে যত গালভরা দাবিই করা হউক না কেন, ব্যক্তির রক্ত পানি করিয়া উপার্জন করা সম্পদকে তাহার নিকট হইতে তাহার মর্জির বিরুদ্ধে কাড়িয়া লওয়ার সমাজের কি অধিকার থাকিতে পারে, সমাজবাদের এই ধ্বজাধারিগণ তাহার কোন যুক্তিই আজও পর্যন্ত উপস্থাপিত করিতে পারে নাই। শ্রমিক-মজুর বা কৃষকের শ্রম-লব্ধ সম্পদ ভোগ করিবার অধিকার যদি পুঁজিদার বা জমিদারের না থাকে তবে সেই মজুরের হাড়াভাংগা পরিশ্রমের ফল হরণ করিবার অধিকার সমাজ কি করিয়া লাভ করিতে পারে? সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কে এই দুইটি মত সাধারণভাবে বর্তমান দুনিয়ার প্রচলিত আছে। ব্যক্তি মালিকানা অধিকার যদি অবাঞ্চিত ও শোষণমূলক হয়, তবে সমাজের নিরুংকুশ মালিকানাও ঠিক তদ্রুপ অস্বাভাবিক, অত্যাচারমূলক এবং মানবতা-বিরোধী, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। উল্লিখিত মতদ্বয়ের প্রথমটি শোষণ পীড়নের চরম ব্যবস্থা আর দ্বিতীয়টি বর্বরতা ও জুলুমের শেষ সীমা। এক্ষণে স্বাভাবত:ই প্রশ্ন জাগিবে যে, ব্যক্তিগত মালিকানা যদি বাতিল ও ধ্বংসাত্মক হয় আর জাতীয় মালিকানার ধারণাও যদি অস্বাভাবিক জালিম ও মানবতা বিরোধী হয়, তাহা হইলে মানুষের উপায় কি? পৃথিবীর এই বিপুল ধন-সম্পদ ও মানুষের পরিশ্রম লব্ধ এই অপর্যাপ্ত ধন ঐশ্বর্যের মালিক কাকে স্বীকার করিতে হইবে? আর কাকে এ সবের মালিক বলিয়া সমর্থন করিলে এই দুনিয়া ও গোটা মানুষ সর্বপ্রকার জুলুম, শোষণ, নিষ্পেষণ ও বর্বরতার অবাঞ্চিত পরিণতি হইতে চিরতরে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে?

মালিকানা স্বত্ব ও ইসলাম

ইসলাম এই প্রশ্নের জওয়াব দিয়াছে এবং সে জওয়াব অতীব সুষ্ঠ ও বিজ্ঞাসম্মত। ইসলাম বলে, পুঁজি বা সম্পত্তির প্রকৃত মালিক ব্যক্তিও নয় সমাজও নয়। ইহার কারণ এই যে, পুঁজি বা সম্পত্তির প্রকৃত মালিক ও সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী সে-ই হইতে পারে, যে তাহা নিজ শক্তির বলে সৃষ্টি করিয়াছে অথবা উৎপাদন করিয়াছে সেই সব শক্তি যোগ্যতা ও সামর্থের যাহা পুঁজি সৃষ্টি করিয়াছে। আর ইহা সর্বজনবিদিত যে, কোন মানুষই দুনিয়ার কোন বস্তু বা শক্তি বা যোগ্যতার সৃষ্টি করে নাই

কোন ব্যক্তি তাহা সৃষ্টি করিয়াছে আর না কোন মানবগোষ্ঠি বা কোন সমাজ। অতীব সুস্পষ্ট কথা-ইহা প্রমাণ করিবার জন্য কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি আবশ্যক করে না।

এই বিশাল দুনিয়ার যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহার সৃষ্টিকর্তা ব্যক্তি বা সমাজের ঊর্ধ্বের কোন সত্তা যাহাকে আমাদের জড়চক্ষু যদিও দেখতে পায় না-কিন্তু মন তাঁহাকে অনুভব করে। মানব-বুদ্ধি তাঁহাকে বিশ্বস্রষ্টা বলিয়া স্বীকার করিতে আমাদেরকে বাধ্য করে। কারণ সৃষ্টিকর্তা যখন ব্যক্তিও নয়, সমাজও নয়, তখন একজন সাধারণ মানুষও এই কথা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা এই মানুষ ও জড়ের অতীত কোন সত্তা। ইসলাম এই সত্তার নাম রাখিয়াছে আল্লাহ। ইসলামের দৃষ্টিতে এই আল্লাহ তা’আলাই সকল বস্তু এবং জীব ও জন্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি করিয়াছেন সকল শক্তি ও যোগ্যতা। কাজেই তিনিই সকল বস্তু এবং জন্তু, সকল সম্পদ এবং সম্পত্তি তথা সকল ব্যক্তি এবং সমাজের সৃষ্টিকর্তা ও একচ্ছত্র মালিক। মানুষের হাতে ধন-সম্পত্তি যাহা কিছু আছে তাহা কোন ব্যক্তি বা সমাজেরই উপার্জিত হউক না কেন, তাহার সব কিছুরই প্রকৃত মালিক আল্লাহ। তিনি দুনিয়ার সুষ্ঠু পরিচালনা ও শৃংখলা বিধানের জন্য মানুষের জন্য নয়; বরং একটি সুনির্দিষ্ট কালের জন্য মাত্র। এই আমানত রাখার মূলে আল্লাহর আর একটি বিরাট উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা হচ্ছে মানুষের পরীক্ষা। আল্লাহ তা’আলা এই সম্পদ এবং সম্পত্তি মানুষের ভোগ ব্যবহারের জন্য দিয়াছেন আর সেই সঙ্গে দিয়াছেন সেই সব ভোগ-ব্যবহার করিবার-তথা ব্যক্তি- মানুষ ও সমাজ-মানুষের সুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনের জন্য একটি পূর্ণ ও সার্বজনীন জীবন বিধান। আল্লাহ তা’আলা ইহার সাহায্যে মানুষকে এই দিক দিয়া পরীক্ষা করিতে চান যে, মানুষ কি এইগুলি নিয়ে ইচ্ছামত ভোগ ব্যবহার করে, না আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী করে। আর এগুলিকে আল্লাহর দেওয়া বিধান মুতাবিক কোটি কোটি মানুষের মধ্যে বন্টন করে, না তিল তিল করিয়া সঞ্চিত ও নিজস্ব ভোগের সামগ্রী করিয়া রাখে। সম্পদ সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কে ইসলামের এ-ই গোড়ার কথা।

এই খানের সমগ্র ব্যাপারটি শেষ হইয়া যায় নাই; বরং আল্লাহ তা’আলা পরিস্কার করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুসারে যার নিকট যত পরিমাণ সম্পদ যা সম্পত্তি থাকুক না কেন তাহাক যে সুষ্ঠুভাবে আল্লাহর বিধান মতো ব্যয় করিবে, তাহাকে তিল তিল করিয়া জমা করিয়া রাখিবে না-এহেন পরীক্ষায় সেই ব্যক্তি সাফল্য লাভ করিতে পারিবে। আর যে

এরূপ করিবে না তাহার জীবন এই পরীক্ষায় ব্যর্থ প্রমাণিত হইবে। মালিকানা সম্পর্কে এই নীতি উপস্থাপিত করিয়া ইসলাম মানবীয় মালিকানার মূলে চিরতরে কুঠারাঘাতে করিয়াছে। এবং ব্যক্তি মালিকানা আর জাতীয় মালিকানা এই উভয় প্রকার ধ্বংসাত্মক মত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র এক নতূন মত-আল্লাহর মালিকানা-পেশ করিয়াছে। এই দৃষ্টিতে মানুষ ধন-সম্পত্তির মালিক নহে, আমানতদার মাত্র। এই মতের ভিত্তিতে ইসলাম তাহার পরিপূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামো রচনা করিয়াছে। এহেন সমাজ ও অর্থব্যবস্থা যে বাস্তব প্রয়োগযোগ্য, এবেং তা যে মানবতার সকল দু:খ-দারিদ্র, শোষণ-নিষ্পেষণ এবং লাঞ্চনা ও অবমাননার একমাত্র একমাত্র প্রতিষেধক তাহার প্রমাণ বিশ্ব-ইতিহাসের এক সোনালী অধ্যায় তাহার বাস্তব পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সেই অধ্যায়ের বিশিষ্টতা, সৌন্দর্য এবং সার্বজনীন কল্যাণকারিতা স্মরণ করিয়া আজও মানুষ শ্রদ্ধায় মস্তক অবনমিত করে।

বর্তমান দুনিয়া যে অস্বাভাবিক, অসমান ও ভুল ত্রুটিপূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থার তলে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইতেছে এবং অসংখ্য ও বিরাট সমস্যা মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়া দুনিয়াকে ধ্বংসের সুখে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহার সমাধান এবং নিখুঁত কল্যাণ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা একমাত্র এই আল্লাহর মালিকানার ভিত্তিতে গড়া ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থায়ই হউক, কিংবা সামাজিক মালিকানার সমাজতন্ত্রই হউক-উভয় ব্যবস্থাই অবৈজ্ঞানিক, ধ্বংসকরী এবং মানব প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী। তাহা কোনদিনই নির্বিশেষে সমগ্র মানুষের কল্যাণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না।

১. ১৯৫১ সালে ১২ই মে দৈনিক ‘আজাদ’ পত্রিকার ‘সাহিত্য মজলিস’ প্রকাশিত।

পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজে মজুরদের অবস্থা

বর্তমান পৃথিবী যে সব জটিল সমস্যার সম্মুখীন, মজুর-শ্রমিকদের মজুরি সমস্যা তন্মধ্যে অন্যতম। মেহনতী জনতার সঠিক ও সুবিচারপূর্ণ মজুরি ও পারিশ্রমিক কি হইতে পরে- যাহাতে একদিকে শ্রমিকগণ নিশ্চিন্ত ও সচ্ছল জীবন যাপন করিতে পারে-বর্তমানে এই প্রশ্নই মানুষের মনকে অত্যন্ত তীব্রভাবে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে।

মজুরি সমস্যা চিরকালই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসাবে পরিগণিত হইয়া আসিলেও শিল্প-বিপ্লবের পরই এই সমস্যা আইন ও নৈতিকতা উভয় দিক দিয়াই দুনিয়ার রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে অত্যন্ত জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে। যন্ত্রের সাধারণ প্রচলন হওয়ার পূর্বে এক একটি কাজ যেখানে এক হাজার মজুর সম্পন্ন করিত ও তাহা হইতে নিজেদের জীবিকা অর্জন করিত-যন্ত্র আবিষ্কৃত ও সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইতে শুরু হওয়ার পর উহা একটি মাত্র যন্ত্র ও কয়েকজন মানুষের দ্বারাই সম্পন্ন হইতে লাগিল, ফলে ব্যাপকভাবে দেখা দিল বেকার সমস্যা। আর প্রত্যেক দেশে যেহেতু মেহনতী জনতার সংখ্যাই সর্বাধিক ও বিপুল হইয়া থাকে, এই জন্য এই সমস্যার জটিলতা কেবল মজুরদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে না; বরং শেষ পর্যন্ত তাহা জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সমস্যায় পরিণত হয়। ১৯৫৬ সনের মার্চ মাসে আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংস্থার পক্ষ হইতে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দুনিয়ার আড়াইশত কোটি জনতার মধ্যে একশত কোটিই শ্রমজীবি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে আর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ইহার সংখ্য হচ্ছে সাত লক্ষ।

বর্তমান বিশ্ব সমাজের যতগুলো আদর্শ ও সমাজ ব্যবস্থা কার্যকর রহিয়াছে, তন্মধ্যে কোন একটিও এখন পর্যন্ত শ্রমিকদের মজুরী সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারে নাই। যে সব দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ও সেই সঙ্গে অবাধ অর্থ শোষণের অবারিত সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান সেইখানে মজুর-শ্রমিকদের ওপর রাষ্ট্র-সরকারের নিরুংকুশ প্রাধান্য ও একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে সেখানে তাহারা বাধ্যতামূলক দাসশ্রম ও সীমাবদ্ধ মজুরীর অভিশাপে জর্জরিত হইতেছে। পার্থক্য এই যে, পুঁজিবাদী দেশে মজুর-শ্রমিকগণ মজুরী সম্পর্কে দর কষাকষি করিতে পারে, দাবি-দাওয়া পেশ করিতে, দাবি আদায়ের জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে পারে, ধর্মঘটের হুমকী দিতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মঘটের সাহায্যে কর্তৃপক্ষেকে বাধ্য করিয়া নিজেদের দাবি অনুযায়ী মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে পারে। কিন্তু সেখানে মজুরদের ওপর একমাত্র সরকারের নিরংকুশ কর্তৃত্ব কায়েম হইয়া আছে সেখানে মজুর-শ্রমিকগণ নিজেদের কোন অভাব-অভিযোগ, মজুরী সম্পর্কে আপত্তি কিংবা অতিরিক্তি কোন দাবি পেশ করিতে পারে না। অন্যথায় নিষ্পেষণ ও শুদ্ধির আঘাতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়া অবধারিত। কিন্তু উভয় প্রকারের সমাজেই যে ব্যাপকভাবে শ্রমিক অসন্তোষ বিদ্যমান রহিয়াছে

এবং কোনমতেই তাহার কোন প্রতিকার ব্যবস্থা করা হইতেছে না, তা সর্বজনবিদিত।

বিগত ১৯৫৪ সনের জানুয়ারী হইতে আগষ্ট পর্যন্ত আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান ও ভারতে যেসব ধর্মঘট সঙ্ঘটিত হইয়াছে তাহা হইতে বর্তমান ব্যাপক শ্রমিক অসন্তোষ সম্পর্কে সুস্পষ্ট অনুমান করা যাইতে পারে। ১৯৫৪ সনের নভেম্বর মাসে বৃটেনের ডক শ্রমিকগণ যে ধর্মঘট করিয়াছিল তাহা কয়েক মাস পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। এই ধর্মঘট শেষ হওয়ার পূর্বে ২০ হাজার ডাক শ্রমিকের সঙ্গে ৭০ হাজার রেল শ্রমিকও ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করে। ইহার ফলে বৃটিশ সরকারকে কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় ও কয়েক মাস পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায়। আমেরিকায়ও অনুরূপ ধর্মঘটের কোন সীমা সংখ্যা নাই। ১৯৫৫ সনের মার্কিন দূতাবাস হইতে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, কয়েক বৎসর পূর্বে আমেরিকায় ১৪ বৎসর কিংবা তদুর্ধ বয়সের বেকারদের সংখ্যা হচ্ছে ২৮: ৩২: ২০৬। আর তাহারা যে মজুর-শ্রমিক ছাড়া অন্য কোন লোক নয় তাহা বুঝিতে কোন কষ্ট হওয়ার কথা নয়। ভারতের অবস্থা আরও মারাত্মক। সেখানে সম্ভবত একটি মাস এমন যায় না যখন সেখানে কোন-না কোন ক্ষেত্রে ধর্মঘট বা দাবি আদায়ের জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় না। ১৯৫৫ সনে কানপুরে সমস্ত বস্ত্রমিলের মজুরগণ Rationalisation এর বিরুদ্ধে কয়েক মাস পর্যন্ত ধর্মঘট করিয়াছিল, যার ফলে ভারতের বস্ত্র-শিল্প কয়েক কোটি টাকার লোকসান স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। এই বিরাট লোকসান দেখিয়া তথাকার সরকার সম্পূর্ণ নীরব ও নিরপেক্ষ ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছিল। অর্থাৎ মজুর-শ্রমিকদের দুরাবস্থা দূরীকরণ এবং তাহা দূর করিবার জন্য মজুরদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে ভারত সরকার কোনই দায়িত্ব বোধ করে নাই। বরং অসহায় ও অভুক্ত-অর্ধভুক্ত মজুর শ্রমিকদেরকে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির বজ্র মুষ্ঠিতে সোপর্দ করিয়া দিয়া জাতীয় সরকার সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ভূমিকা অবলম্বন করে। একটি ধর্মহীন পুজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মজুরদের যে কি দুরাবস্থা ভারত সরকারের নিষ্ক্রীয় ভূমিকা ও ভারতের মজুরদের অবস্থা হইতেই সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যায়। ১৯৬৪ সনে অক্টোবরে-নভেম্বর মাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে চটকল সমূহে যে ব্যাপক ও একটানা দেড় মাসাধিকালের ধর্মঘট চলে এবং এ

ব্যাপারে তৎকালীন সরকার যে নিরপেক্ষ ভূমিকা অবলম্বন করে, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

রাশিয়া, চীন ও পূর্ব ইউরোপের যে সব দেশের মজুরদের রাজত্ব কায়েম রয়েছে, রাষ্ট্রের নির্মম ও নিরংকুশ নিয়ন্ত্রণের দরুন সে সব দেশের মজুরদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আমরা খুব বেশি কিছু জানিতে পারি না। কিন্তু তা সত্ত্বেও শাসকদের অনুবীক্ষণ হইতে বাঁচিয়ে যেসব তথ্য প্রকাশিত হয় কিংবা বৈদেশিক পর্যটকদের মারফতে বহির্বিশ্ব যাহা কিছু জানিতে পারে তাহা হইতে এতটুকু অনুমান করা কিছুমাত্র কঠিন নয় যে, এই সব মজুর-রাষ্ট্রে শ্রমিক মজুরদের অবস্থা পুজিবাদী দেশ বিশেষত: আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের মজুরদের অপেক্ষা কিছুমাত্র উন্নত নহে। মেহনতী জনতাকে শ্রান্ত ও দমন করিবার জন্য সেখানে কর্মীদের নির্মম হস্তে ধোলাই করা হয়, অপরদিকে কঠোর বাধ্যতামূলক শ্রম ও সীমাবদ্ধ মজুরির নিপীড়নে তাহাদিগকে জর্জরিত হইয়া থাকিতে হয়।

যেসব দেশে বাক-স্বাধীনতা রহিয়াছে এবং যেসব দেশের সরকার বার্ষিক রিপোর্ট ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া থাকেন, সে সব দেশের মজুর-শ্রমিকদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানিতে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু যেখানে কেবল মুখ ও লেখনীর উপরই নহে মানুষের চিন্তা ও কল্পনা শক্তির উপর পর্যন্ত কঠোর পাহারা বসানো হইয়াছে, সেখানকার মজুরদের অবস্থা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু তবুও যতটুকু বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে তা-ই এখানে পেশ করা যাইতেছে।
রাশিয়ার সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান তাস-এর পাক্ষিক মুখপত্র ‘সোভিয়েত দেশ’ এ সোভিয়েট রাশিয়ায় কি সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে’ শীর্ষক প্রবন্ধে মজুরদের অবস্থা লিখিতে গিয়া বলা হইয়াছে: তাহাদের বাস্তব প্রয়োজন পূরণ করিবার ব্যাপারে এখানো পুরোপুরি সাম্য কায়েম করা হয় নাই। কেননা তাহারা সমাজ হইতে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী নহে; বরং শ্রম মেহনত অনুযায়ী অংশ পাইয়া থাকে। ইহা শ্রমিকদের প্রয়োজন পূরণের ব্যর্থতা সম্পর্কে এমন একটি রাষ্ট্রের স্পস্ট স্বীকৃতি যা বিগত ৩৮ বৎসর পর্যন্ত দুনিয়ার অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার শ্লোগান দিয়া আসিতেছে।

মজুরগণ তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কবে ও কোন দিন উৎপাদনের অংশ পাবে, কিংবা আদৌ কোনদিনই পাবে কিনা তাহা নিশ্চিত করিয়া

বলা মুশকিল। কিন্তু পরিশ্রম অনুযায়ী তাহারা কত এবং কিভাবে মজুরি পাইয়া থাকে এবং তাহাদের শ্রমের সঠিক মূল্য নির্ধারণ কারা করিয়া থাকে, তাহা অবশ্যই আলোচিত হইবে। উপরোন্ত সরকারী সাধারণ কর্মচারী ও মজুর-শ্রমিকদের মজুরির ক্ষেত্রে যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভারতের প্রখ্যাত সমাজতান্ত্রিক নেতা মিসেস সূচেতা কৃপালনী ১৯৫৪ সনের মধ্যভাগে রাশিয়া সফরান্তে যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহার একাংশ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে; তিনি বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন:

শ্রমিকদের সঠিক মজুরি কত, তাহা জানিতে পারা আমাদের পক্ষে কঠিন ছিল। যখনই আমরা বিশেষ কোন শিল্পক্ষেত্রে সেখানকার মজুরদের উচ্চ ও নিম্ন বেতনের পরিমাণ জানিতে চাহিয়াছি তখনই আমাদিগকে মাঝামাঝি পরিমাণই বলা হইয়াছে। তাহারা পরও খুটিয়া খুটিয়া জিজ্ঞাসা করিলে পরে জানা গেল যে, নিম্নতম মজুরি হইতেছে পাঁচশত রুবেল, অথচ কারখানার ডাইরেক্টর পাঁচ হাজার হইতে সাত হাজার রুবেল পর্যন্ত বেতন পাইয়া থাকেন। অর্ধ সপ্তাহিক ‘দাওয়াত’ ২৫ জুলাই ১৯৫৪।

লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, খুটিয়া খুটিয়া জিজ্ঞাসা করিবার পরই এই নিম্নতম মজুরি জানিতে পারা সম্ভব হইয়াছে। দ্বিতীয়ত: ইহাও অসম্ভব নয় যে, ইহা সেই কারখানার অবস্থাও হইতে পারে, যাহা কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যে সর্বোত্তম ও যা বিদেশী পর্যটকদের দেখাইবার জন্য ও বহির্বিশ্বে সুনাম অর্জন করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে।

তদুপরি পাক-ভারতের লোকদের নিকট পাঁচ শত রুবেল খুব বিরাট কিছু মনে হইবে এবং তাহারা মনে করিবে যে, সেখানকার নিম্ন বেতনভোগী সাধারণ মজুরদেরও জীবন মান বুঝি কতই না উন্নত! কিন্তু রাশিয়ার দ্রব্যমূল্যের উচ্চতা ও বেতনের মধ্যে যে ৫০-১ পার্থক্য রয়েছে সেই দৃষ্টিতে যাচাই করিলে পাঁচ শত রুবেলের কোন ধোকাই টিকিয়া থাকিবে না। মজুরি কম কিংবা বেশি তাহা নির্ধারণের জন্য দ্রব্যমূল্যই হইতেছে সঠিক মাপকাঠি। এই জন্য এইখানে তাহার একটি চার্ট দেওয়া যাইতেছে।

১৯৫৪ সনের আগস্ট মাসে ভারতীয় পার্লামেন্টের প্রভাবশালী সদস্য জ্ঞানী গৌরমুখ সিংহ রাশিয়া সফর করিয়া যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়াছেন, এখানে তাহার কিছুটা উল্লেখ করা যাইতেছে। তিনি বলিয়াছেন:

“রাশিয়ার সাধারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য দেখিলে পাঁচশত রুবেল মজুরির রহস্য বুঝিতে পারা যায়। মনে রাখা দরকার যে, একটি রুবলের মূল্য আমাদের দেশী টাকা অনুসারে ১,০৯ টাকা মাত্র; কিন্তু সেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদীর মূল্য নিম্নরূপ: একটি ডিমের মূল্য ৩ রুবেল, একটি মোরগের মূল্য ২৫ রুবেল, টমেটোর প্রতি কেজি মূল্য ২ রুবেল, দুগ্ধ প্রতি কেজি মূল্য ২০ রুবেল, আলুর প্রতি সের মূল ৬ রুবেল, মূলার প্রতি কেজি মূল্য ৫ রুবেল, গাজর প্রতি কেজি মূল্য ৮ রুবেল শালগমের প্রতি কেজি মূল্য ৭ রুবেল, ডবল রুটির প্রত্যেকটির মূল্য ২ রুবেল, বকরীর গোশত প্রতি সের মূল্য ১৮ রুবেল, ৬ সিট কাগজের মূল্য ৪ রুবেল, একটি শীতল কোর্তার মূল্য ৪ রুবেল, গমের এক মণ মূল্য ৮৫ রুবেল, মেয়েদের ছোট ব্যাগ প্রতিটি ৯০ রুবেল। এইখানে শুধুমাত্র কয়েকটি জিনিসের মূল্যের উল্লেখ করা হইল। ইহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, সেখানে একজন মজুর পাঁচশত রুবেল বেতন পাইলেও তাহার জীবন মাত্রা মোটেই সচ্ছল হইতে পারে না। আর কেবল রাশিয়ায়ই নহে, প্রতিটি কমিউনিস্ট দেশেরই এই অবস্থা। আন্তর্জাতিক শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে সাম্প্রতিক প্রকাশিত এক ইশতেহার হইতে এইসব দেশের শ্রমিকদের মর্মান্তিক অবস্থা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। তাহাতে স্পষ্ট স্বীকার করা হইয়াছে যে, “চেকোস্নোভাকিয়ার মজদুরদের দ্বারা ক্রীতদাসেদের ন্যায় কাজ সম্পন্ন করা অত্যন্ত ভয়ানক পদ্ধতি। রাশিয়ার আইনে রাজনৈতিক সন্দেহসূত্রে শ্রমিকদিগকে বাধ্যতামূলক দাস শ্রমিকদের ক্যাম্পে বন্দী করিয়া রাখার সুযোগ রহিয়াছে।

অত:পর চীনের মজুর শ্রমিদের অবস্থা সম্পর্কেও খানিকটা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। কেননা আমাদের দেশের এক শ্রেণীর কমিউনিস্ট প্রচারক আজকাল কথায় কথায় চীন দেশের দোহাই দিয়া থাকেন।

১৯৫৩ সনে এপ্রিল মাসে ‘ইন্ডিয়ান ওযার্কার্স ডেলিগেশন’ এর সদস্য হিসাবে ব্রজকিশোর শাস্ত্র সরকারী আমন্ত্রণক্রমে চীন গমন করে। সেখানে তিনি মজুর-শ্রমিকদের অবস্থা জানিবার জন্য বিশেষ কৌতুহল প্রকাশ করেন। প্রায় ছয় সপ্তাহ কাল পর্যন্ত চীন ভ্রমণ করিয়া তিনি সেখানকার মজুর-শ্রমিকদের সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নরূপ:

“এখানে আমরা হালের সঙ্গে বলদের পরিবর্তে মেয়েলোককে বাঁধা দেখিয়াছি। সে কত মর্মান্তিক ও অমানুষিক দৃশ্য। মেয়েলোক-তাহাকে হালের সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে।

চীনের ইংয়াংস্টেরি ভারপ্রোজেক্ট-এ সব মজুর শ্রমিককে তিনি কাজ করিতে দেখিয়াছেন, তাহাদের সম্পর্কে তিনি বলেন:

“এই প্রোজেক্ট-এর নিকটে অফিসারদের থাকিবার বাংলা নির্মাণ করা হইয়াছে। প্রায় পাঁচ হাজার মজুর এখানে কাজ করে। সকল প্রকার পাথর ভাঙ্গা হইতে শুরু করিয়া সুড়ঙ্গ খোদাই করা কিংবা পাথরে চটান স্থানান্তরিত করা, প্রভৃতি যাবতীয় কাজই অনাবৃত হাতে করা হইয়াছে। মজুরগণ যে সব হাতিয়ার ব্যবহার করিতেছিল, তাহা ছিল খুবই দুর্বল ও প্রায় অকেজো এবং নিকৃষ্ট ধরণের। মনে হইতেছিল যে, তাহা কোন যাদুঘর হইতে আনা হইয়াছে।

তিনি বলেন, “আমি এই দৃশ্য দেখিয়া মুহূর্তের জন্য হতচেতন হইয়া পড়িলাম। চীন দেশের মেহনতী লোকদের দ্বারা যেভাবে কাজ করানো হইতেছে তাহা দেখিয়া তাহার অনুকরণ করা যা তাহা হইতে কোন প্রকার প্রেরণা লাভ তো দূরের কথা; বরং বড়ই দু:খ ও বেদনা পাইলাম। আমি ভীত বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। মানুষ আর যাহাই হউক জন্তু নয়। কোন দেশের উন্নয়নের ব্যাপারে জন্তুদের স্থানে মানুষকে ব্যবহার করা মানবতার উপর নির্মম জুলুম ও চরম অমানুষিকতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

ইহার প্রতিবাদ করারও ভাষা নাই। মজুরদের বেশির ভাগ বহু দূর-দুরাঞ্চল হইতে আনা হইয়াছে। বর্তমান চাকুরী ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়ার তাহাদের কোন পথ নাই। মূলত চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি ও প্রেসিডেন্ট মাও সেতুং এখানে বাধ্যতামূলক অমানুষিক শ্রমের রাশিয়া-পরীক্ষিত ‘কার্যপদ্ধতি’ প্রয়োগ করিয়াছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী শাস্ত্রী মহাদয়ের এই বিবরণের পর চীনা মজুরদের অবস্থা সম্পর্কে আর বেশি কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। অবশ্য উল্লেখযোগ্য এই যে, এইরূপ বাধ্যতামূলক অমানুষিক প্ররিশ্রমের পর তাহারা মজুরী বাবদ যাহা কিছু পায় তাহা পাক-ভারতের সরকারী অফিস ও কারখানার মজুরদের বেতন অপেক্ষা অনেক কম।

একজন চীনা শ্রমিক এক হাজার পনেরো শত ‘ইয়ান’ কিংবা পঞ্চাশ ইউনিট পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে। (এক ‘ইয়ান’ তৎকালীন

পাকিস্তানের এক পয়সার একটু বেশি ও এক ইউনিট আট আনা কিংবা তাহার একটু বেশির সমান’ আর পঞ্চাশ ইউনিটে আমাদের ২৫/২৬ টাকার সমান হয়)। এই সামান্য ও সংক্ষিপ্ত পারিশ্রমিক নিয়ে একজন শ্রমিক যখন বাজারে যায় তখন চেতনা হরণকারী দ্রব্যমূল্যের সম্মুখীন হইতে হয়। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহোদয় বলেন:

“নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য ভারত অপেক্ষা চীন দেশে অনেক বেশি। চাউল, কাপড়, তৈল, লবণের মূল্য অপেক্ষা পঞ্চাশ ভাগ বেশি। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জিনিসের মূল্য সম্পর্কে ধারণা করাও কঠিন।”

প্রত্যক্ষদর্শীর এই বর্ণনার ভিত্তিতে অনায়াসেই এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, বৃটেন ফ্রান্স আর স্বয়ং আমাদের দেশে অন্তত: সরকারী মজুর ও কারখানার কুশলীরাও কি এই অপেক্ষা অনেক বেশি বেতন বা মজুরি পায় না? আর চীন অপেক্ষা এই সব দেশের দ্রব্যমূল্যও কি অনেক কম নয়? এতৎসত্ত্বেও আজ এদেশের এক শ্রেণীর কমিউনিস্ট চীন ও রাশিয়াকে ‘স্বর্গরাজ্য’ বলিয়া মনে করে এবং অবুঝ যুবক-যুবতীদের সাহায্যে বিভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করে। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সঠিক জ্ঞানের আলোকে এই সব অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির অন্ধকার যতশীঘ্র দূর হইয়া যায় মানবতার পক্ষে ততই মংগল-তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সাপ্তাহিক ‘জাহানেও নও’ পত্রিকার শ্রমিক উন্নয়ন সংখ্যায় প্রকাশিত।

ইসলামে মজুরদের অধিকার

বর্তমান দুনিয়ার পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা এবং জমিদারী ও সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থা মারাত্মকরূপ ধারণ করিয়াছে। একদিকে আজ পুঁজিদার কারখানা মালিকদের হাতে মজুর-শ্রমিকগণ, অপরদিকে বড় বড় জমিদার সামন্তদের কবলে গরীব কৃষকগণ নির্মমভাবে শোষিত ও নিষ্পেষিত হইতে। অভাব ও দারিদ্র, অনশন ও অর্ধাশসনের উপর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম তাহাদের স্বাস্থ্যের মেরুদন্ড ভাঙিয়া দিয়াছে। শ্রেণী বৈষম্যমূলক আচার-আচারণ তাহাদের নৈতিক ও মানসিক শক্তিকে ক্ষুন্ন করিয়াছে।

কৃষক-মজুরদের এই চরম দুরবস্থাকে একদল মানুষ নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিতেছে। তাহারা

মার্কস-লেলিনের প্রেতাত্মা স্ট্যালিন-ক্রশ্চেভের গুপ্তচর হইয়া পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সমগ্র পৃথিবীকে কমিউনিস্ট সমাজ ব্যবস্থার লৌহ-নিগড়ে বন্দী করিবার উদ্দেশ্যে কুটিল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া আছে। বর্তমান দু:খী ও বঞ্চিত মানবতাকে চীন রাশিয়ার সুখী (?) সমাজের উন্নত (?) জীবনধারার বিচিত্র কাহিনী শুনাইয়া প্রলুব্ধ করিতেছে এবং দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের কারখানা আর জমির মালিকদের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছে। “তোমাদের সকল প্রকার দু:খ এবং দুর্গতির অবসান (?) ঘটাইতে পারে একমাত্র কমিউনিজন এবং কমিউনিস্ট সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ভিন্ন অন্য কোন আর্দশের তোমাদের দুরবস্থা দূর করিতে পারে না- প্রচ্ছন্ন অপ্রচ্ছন্ন সকল প্রকার কমিউনিস্টদের মুখে এই প্রচারণা বনাম প্ররোচনা খুব জোরালো হইয়া উঠিয়াছে। দুনিয়ার অন্যান্য দেশের ন্যায় এই দেশেও চীন ও রাশিয়ার অসংখ্য গুপ্তচর বিভিন্ন বেশে কাজ করিয়া যাইতেছে। চাষী মজুরদের প্রতি সহনুভূতি প্রদর্শন করিয়া অন্ন বস্ত্রের আওয়াজ তুলিয়া আন্দোলন আর সংগঠনের কাজ অবিশ্রান্তভাবে-আর কতকটা অবাধে-চালাইয়া যাইতেছে।

অপরদিকে কমিউনিজমের এই প্রচারণার গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে যেসব উপায় অবলম্বন করা হইতেছে তাহা এতই হাস্যকর যে, সমাজ-বিজ্ঞান সম্পর্কে সামান্য ধারণা থাকিলেই ইহার বাতুলতা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কমিউনিজম আর কমিউনিস্টদের দোষ-ত্রুটি, অন্যায়-অনাচার, নির্যাতন আর অসচ্ছরিত্রের কথা বর্ণনা করা, প্রচার করা আর বক্তৃতা- বিবৃতি দেওয়াই উহার সয়লাব-স্রোত রোধ করিবার জন্য কিছুমাত্র যথেষ্ট নয়। সেইজন্য দরকার বর্তমান সমাজের এই অশান্ত ও অসম অবস্থার পরিবর্তন সাধন করা, এক উন্নতকর সুষ্ট অর্থ ব্যবস্থার সাহায্য মজুর-শ্রমিক-তথা কোটি কোটি মানুষের অর্থনৈতিক দুর্গতির চির অবসান ঘটান। বস্তুত কমিউনিজমের সয়লাব স্রোতের এ-ই একমাত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা, অন্য কিছু নয়। ভুল আদর্শই হউক আর বিজ্ঞানসম্মত সত্য আদর্শই হউক, কেবল ফাঁকা বুলি দ্বারা কমিউনিজমের পতিরোধ করা বা উহার প্রচার বন্ধ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। যতদিন পর্যন্ত বর্তমান সমাজে এই মৌলিক ত্রুটিগুলি এবং সামাজিক শোষণ-পীড়ণ ও অবিচারের ভিত্তিমূল চূর্ণ করা না হইবে, যতদিন এ অবস্বাভাবিক অর্থনৈতিক অসামাঞ্জস্য দূর করিয়া এক সুস্থ, সুন্দর, সুমৃদ্ধ, সুসমঞ্জস সমাজের সৃষ্টি করা না যাইবে,

ততদিন কমিউনিজমের সংক্রামক ব্যাধি কিছুতেই দুর করা যাইবে না।

কাজেই আজ বিশেষভাবে কমিউনিজমের মৌলিক দোষত্রুটি এবং ভিত্তিগত ধ্বংসকারিতার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মজুর -কৃষক তথা গোটা সমাজের সম্মুখে অপর একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থ -ব্যবস্থা সুষ্ঠুরূপে পেশ করিতে হইবে। এই কাজ শুধু মুখে করিলেই চলিবেনা , বাস্তব কর্মাদর্শ ও কার্যকর প্রোগ্রাম লইয়াই এক দিকে অগ্রসর হইতে হইবে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে উহার পুন :প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য , এই ধরনের অর্থব্যবস্থা -যাহা সর্বপ্রকার সৌন্দর্য ও সার্বজনীনতাপূর্ণ এবং ইহকাল ও পরকালের সকল রকম কল্যাণ ব্যবস্থার মূল উৎস হইতে পারে , তাহা ইসলাম ছাড়া আর কিছুই নহে। বর্তমান প্রবন্ধে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মজুর -শ্রমিক আর কৃষকদের অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিতে চাই। এই আলোচনার সুযোগে আমি এদেশের জমি-মালিক, পুঁজিদার ও কারখানা মালিকদিগকে অবিলম্বে ইসলাম নির্দিষ্ট অধিকার সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিব। কারণ , তাহাতেই সকল শ্রেণীর মানুষ -তথা গোটা দেশের কল্যাণ একান্তভাবে নিহিত রহিয়াছে ; আর তাই সকল প্রকার অমঙ্গল ও ভাঙ্গন -বিপর্যয়ের নির্মম আঘাত হইতে গোটা সমাজকে রক্ষা করিতে পারে।

সর্বপ্রথম একথা সুস্পষ্টরূপে জানিয়া লওয়া দরকার যে , মজুরি খাটা অর্থাৎ নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পরের কাজ করা, অন্য কথায় শ্রমের মূল্য আদায় করা বা গ্রহণ করা - ইসলামের দৃষ্টিতে কিছুমাত্র হীন বা ঘৃণার্হ কিংবা বর্জনীয় নয়। বিশ্ব নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল : اَيُّ الْكَسِبَ اَطْيَبُ "কোন প্রকারের উপার্জন উত্তম ও পবিত্রতর। " উত্তরে তিনি ইরশাদ করিয়াছেন : "ব্যক্তির নিজ শ্রমের উপার্জন এবং সৎ ব্যবসায় লব্ধ মুনাফা। "

পরিশ্রম করিয়া উপার্জন করিবার প্রতি উৎসাহদান করিবার জন্য তিনি বলিয়াছেন : اَلْكَاسِبُ حَبِيْبُ اللهِ হালাল উপায়ে উপার্জনকারী ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধু।
অপর এক হাদীসে বলা হইয়াছে :
اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدِ الْمُحْتَرِفِ ـ
উপার্জনের কোন পেশা গ্রহণকারী বান্দাহকে আল্লাহ তা 'আলা ভালবাসেন।

তিনি আরো বলিয়াছেন :
اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الصَّا نِعَ الْحَاذِقَ ـ
চতুর ও দক্ষ শিল্পীকে আল্লাহ তা ’আলা ভালবাসেন।

সদুপায় অর্থ উপার্জনের প্রতি মানুষকে পথনির্দেশ করিবার কাজ তিনি কেবল মুখেমুখে বলিয়াই সমাধা করেন নাই। তিনি নিজে কার্যত পরিশ্রম করিয়া উপার্জনও করিয়াছেন , অন্যের মূলধনে নিজের শ্রম যোগ করিয়া ব্যবসা করিয়াছেন। আলী রা . কুপ হইতে পানি তুলিয়া খেজুরের বাগান সিক্ত করিয়াছেন এবং এই পরিশ্রমের বিনিময়ে তিনি কিছু পরিমাণ খেজুর মজুরী স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। এইভাবে যাহারাই একনিষ্টভাবে ইসলামী আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন , তাহারা শ্রম ও মজুরির সাহায্য উপার্জন করিয়া দুনিয়ার সম্মুখে সুস্পষ্ট নিদর্শন সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইমামগণ , প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ আলিম ও ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ পর্যন্ত মজুরি ও সাধারণ পেশার কাজ করিয়া রোজগার করিয়াছেন। এই সম্মানিত ব্যক্তিদের আদর্শ ও জীবন-কাহিনী দুনিয়ার ইতিহাসে উজ্জল অক্ষরে লিখা থাকিবে।

উমর ফারুক (রা) বলিয়াছেন , “তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যেন শ্রম -মেহনত করিয়া অর্থোপার্জনের কাজ বন্ধ করিয়া না দেয় এবং এই বলিয়া যেন বেকার হইয়া বসিয়া না থাকে যে , “হে খোদা তুমি আমাকে খাবার দাও ”। কারণ তোমরা ভাল করিয়া জান যে , আকাশ হইতে সোনা চান্দি ঝরিয়া পড়ে না। ”

এক কথায় জীবিকা উপার্জনের জন্য কোন পেশা অবলম্বন করা , সৎ চাকরী বা মজুরি খাটিয়া জীবন যাপন করা ইসলামের দৃষ্টিতে মূলত অন্যায় বা নিন্দনীয় নয় এবং উপার্জনের সঙ্গত কোন উপায় অবলম্বন করিবার দরূন কাহারো মনে কোনরূপ হীনতাবোধ জাগ্রত হওয়াও উচিৎ নয়। মজুর নিজে নিজেকে কখনো ছোট ও নীচ মনে করিবে না , আর কারখানার মালিককেও কোনদিকে দিয়াই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করিবে না। পক্ষান্তরে কারখানা মালিক নিজেও নিজেকে মজুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর এবং মজুরকে নিজ অপেক্ষা হীনতর বলিয়া মনে করিবে না। বস্তুত পণ্যৎপাদনের ব্যাপারে শ্রম ও মূলধনের সমন্বয় অপরিহার্য। কারণ তাহা ব্যতীত পণ্যৎপাদনের ব্যাপারে শ্রম ও মূলধনের সমন্বয় অপরিহার্য। কারণ তাহা ব্যতীত পণ্যৎপাদন মাত্রই সম্ভব নয়। তাই এই উদ্দেশ্যে পুঁজিদার ও শ্রমিকের সমন্বয় সাধন একান্ত আবশ্যক। অতএব পরস্পর পরস্পরকে পাণ্যৎপাদনের ক্ষেত্রে সহকারী ও সহযোগী বলিয়া মনে করিবে।

[illegible]

[illegible]:

هُمْ اَخْـوَ اَنُكُمْ جَعَلَهُمُ اللـهُ تَحْتَ اَيْـدِ يْكُمْ ـ فَمَنْ جَعَـلَ اللـهُ اَخَـاهُ تَحْتَ يَـدِهِ فَلْيُعْمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ يُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبِسُ وَلاَ يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَانُغْلِبُهُ فَـاِنْ كَلَّفُـهُ مَا يُغْلِبُعِنْــــــــــــــهُ عَلَيْــــــــــــــهِ ــــــــــــــ (رواه البخــــــــــــاري)

[illegible]

[illegible]:

[illegible]

[illegible]

শ্রমিককে যদি নিজের ভাই বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে আর কোন সমস্যাই থাকিতে পারে না। শ্রমিক ও মজুরের যাবতীয় দু:খকষ্ট দূর করা এবং সর্বোতভাবে তাহার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করাই তখন কারখানা মালিকের কর্তব্য হইবে। কিন্তু বিশ্বনবীর এই কথা এই অস্পষ্টতার মধ্যে শেষ হইয়া যায় নাই, তিনি আরো স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন।

২. অন্তত খাওয়া-পরা-থাকা প্রভৃতি বুনিয়াদী প্রয়োজন পূর্ণ করা পর্যন্ত মজুর ও মালিকদের আর্থিক অবস্থা একেবারে সমান-স্তরের হইতে হইবে। মালিক নিজ যা খাইবে, তাহাই মজুর ও শ্রমিককে খাইতে দিবে, যাহা নিজে পরিধান করিবে মজুরকেও তাহাই পরিধান করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। কেবল গার্হস্থ্য পর্যায়ের শ্রমিক-মজুরদের সম্পর্কেও ইসলামের ইহা বিধান। এই আদেশ হইতে মজুরে পারিশ্রমিক নির্ধারণের ব্যাপারে ইসলামের লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গিও নি:সন্দেহে জানিতে পারা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই আদেশকে মালিকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেওয়া কোনক্রমেই ঠিক হইবে না; বরং ইসলামী হুকুমত আইনের সাহায্যে এইরূপ আচরণকে প্রত্যেক মালিক ও মূলধনীর পক্ষে অবশ্য করণীয় ও বাধ্যতামূলক করিয়া দিবে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন: لِلْمُلَوْكِ طَعَامُهُ وَكَسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوْفِ - মজুর-শ্রমিক ও ভৃত্যদের যথারীতি খাদ্য ও পোষাক দিতে হইবে। উল্লিখিত হাদীস হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, ইসলামী হুকুমতের অধীন প্রত্যেক মজুর ও শ্রমিককে মালিকের সমান স্তরের খাওয়া-পরা-থাকা প্রভৃতি বুনিয়াদী প্রয়োজন পূরণ করিবার পরিমাণ অনুপাতে পারিশ্রমিক অবশ্যই দিতে হইবে। বর্তমান সময় মজুরির হার যদি এতটুকু পরিমাণও বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয় এবং মালিক ও মূলধনী মালিকদের মানের খাওয়া-পরা-থাকা ইত্যাদি শ্রমিক ও শ্রমিকের সন্তানরাও লাভ করিতে থাকে, তাহা হইলে তথায় শোষণ বলিতে কিছুরই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, থাকিতে পারে না কোন শ্রেণী বিদ্বেষ। শ্রেণী-বৈষম্যের তৈল খনিতে আগুন লাগাইয়া মারত্মক ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি করাও কাহারো পক্ষে সম্ভব হয় না।

৩. সময় ও কাজের কঠোরতা-উভয় দিক দিয়াই মজুরকে সক্ষম ও সামর্থ করিয়া রাখিতে হইবে। এমন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কাজে নিযুক্ত রাখা বা এমন কোন কাজের বোঝা মজুরের মাথায় চাপাইয়া দেওয়া

যাইবে না , যাহা করিতে সে একেবারেই অসমর্থ কিংবা যাহা করিলে সে ক্লান্ত হইয়া পড়িবে বা তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যাইতে পারে :

وَلاَيُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَــلِ اِلاَّ مَــايُطِيْقُ — মজুরদের সাধ্যের অতীত কোন কাজকরিতে তাহাদিগকে বাধ্য করিবে না।

বিশ্বনবীর এই ছোট কথাটি মজুর -শ্রমিকদের জন্য চিরন্তন রক্ষাকবচ। বর্তমান যুগে মজুরদের কাজের সময়ের পরিমাণ এবং কাজের স্বরূপ নির্ধারণ শ্রমিকদের এই দুইটি প্রধান ও বুনিয়াদী সমস্যার সমাধান এই ছোট বাণীটির ভিত্তিতেই অতি সুন্দরভাবে করা যাইতে পারে। সহজ কথায় বলিতে গেলে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কাজের গুরুত্ব অনুপাতে সাধারণভাবে যে কয় ঘন্টা শ্রম করা সম্ভব ঠিক তত ঘন্টাই মজুরদের নিকট হইতে কাজ লওয়া যাইবে এবং ততটুকু সময়ের কাজের বিনিময়ে তাহাকে পূর্ণ একটি দিনের বুনিয়াদী প্রয়োজন পূরণ করিবার সমান মজুরি দিতে হইবে।

৪. এমন কোন কঠিন কাজ যদি এসে পড়ে বা সমাধা করা মজুরের পক্ষে নানা কারণে দু :সাধ্য , যথা -কারখানার বর্তমান মজুর সমাধার জন্য যথেষ্ট শারীরিক শক্তি মজুরের নাই , এমতাবস্থায় সে কাজটি অসম্পূর্ণ রাখা হইবে এবং সামগ্রিক প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন এইভাবে বন্ধ করিয়া দিয়া কারখানা অচল করে দেওয়া হইবে -তাহা মোটেই সমীচীন নহে। পক্ষান্তরে মজুরদের শক্তি থাকুক তাহাদের দ্বারা সে কাজ অবশ্যই জোর করিয়া করান হইবে বা তা করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করা হইবে - ইহাও হইতে পারে না। এহেন অবস্থায় ইসলামের নির্দেশ এই যে , বর্তমান মজুরদিগকে সেই কাজে নিযুক্ত করিয়া দিয়া , সেইকাজ সমাধার জন্য যথেষ্ট জনশক্তি ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির শক্তি অথবা সময় -সুযোগের শক্তি দিয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। হাদীসে উল্লিখিত فَاَعْيِنُوْهُمْ শব্দটির অর্থ এই নয় যে, এহেন অবস্থায় মালিক বা মূলধন নিজেই মজুরদের সঙ্গে কাজে নামিয়া পড়িবে। কারণ তা সব সময় সম্ভব ও সহজ হয় না এবং একজন বা দুইজনের শারীরিক সাহায্য সেই কাজ সমাধার জন্য যথেষ্ট না -ও হইতে পারে। আর তাহার প্রয়োজনও কিছু নেই। বরং বর্তমান মজুরদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কাজের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করিলেই যথেষ্ট হয়। মজুরদের শক্তি বৃদ্ধি করিবার একাধিক উপায় হইতে পারে ;আর তাহা প্রয়োজন অনুপাতেই করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে মজুরের সংখ্যা বাড়াইয়া দিতে হইবে। সেই জন্য আবশ্যক হইলে মজুরির হারও বৃদ্ধি করিতে হইবে। এক কথায়

উপস্থিত কাজ সম্পন্ন করিতে যথাসম্ভব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যেমন দেশ ও জাতির প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন বন্ধ বা ব্যবহৃত না হয়, কারখানা-মালিকের কাজেরও যেন সমাধা হয়, মজুরদের উপর সাধ্যাতীত কোন কাজেরও যেন চাপ না পড়ে। ইসলামে শ্রমিকদের যাবতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য ইহাই প্রধানতম মূলনীতি।

বর্তমান যুগে কারখানা-মালিক ও মজুর-শ্রমিক এবং পুঁজি ও শ্রমের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বৈষম্যের যে আকাশ ছোঁয়া তুফান জাগিয়া উঠিয়াছে, এই হাদীসের ভিত্তিতে তাহার সুন্দর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ অবসান সাধন করা অতীব সহজ।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় ইহা মোটেই মন ভোলানো প্রস্তাব কিংবা ‘খেয়ালী স্বর্গ’ বিশেষ নয়। ইহা একটি বাস্তব কর্মাদর্শ। ইহার ভিত্তিতে মানবেতিহাসে এক সোনালী অধ্যায়ে সমাজের যাবতীয় আর্থিক সমস্যার সমাধান করা হইয়াছিল। বাস্তবক্ষেত্রে তদনুযায়ী কাজ করিয়া একটি যুগের মানুষের জীবনকে সুখ-শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী করিয়া তোলা হইয়াছিল। ফলে তৎকালে শ্রম-মজুরি এবং শ্রমিক মূলধনীদের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্য, শ্রেণী-সংগ্রাম ও শ্রেণী- বিদ্বেষ সৃষ্টি হইতে পারে নাই। উপরোল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন আবুযার গিফারী (রা)। তিনি বলিয়াছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখে এই পবিত্র বাণীটি ঠিক সেই সময় শুনিয়াছেন, যখন তিনি ও তাঁহার ভৃত্য ঠিক একইরূপ পোশাক পরিহিত ছিলেন। তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে উত্তরে তিনি এই হাদীসটি ইরশাদ করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা শুনিয়া বলিয়াছিলেন; তোমরা মধ্যে এখনও কি জাহিলী যুগের বদ-অভ্যাস বর্তমান আছে? অর্থাৎ ভৃত্যকে ভর্ৎসনা করা জাহিলী স্বভাব-বিশেষ, ইসলাম তা বরদাশত করে না। অত:পর প্রতিটি ব্যাপারে পূর্ণ সমতা রক্ষা করাই আবু যারের আজীবনের কার্যসূচীতে পরিণত হইয়াছিল। ওমর ফারুক (রা) এর বায়তুল মাকদাস সফরকালে উষ্ট্র চালনার কাজে ভৃত্যের সাথে আধাআধি ভাগ করিয়া লওয়ার ঘটনা এক ঐতিহাসিক ব্যাপার। তিনি মদীনার চতুর্দিকে রাত নিশিথে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং যেখানে কোন মজুর-দাসকে কোন কঠিন কাজে নিযুক্ত দেখিতে পাইতেন তাহাকে তাহা হইতে মুক্তি দিতেন এবং কাহাকেও তাহার ন্যায়সংগত মজুরি কম পাইতে দেখিলে তাহার মজুরি বৃদ্ধি করিয়া প্রয়োজন পরিমাণ দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

শ্রমিক -মজুরদের প্রতি বর্তমান যুগের পুঁজিদার ও কারখানা - মালিকদের আচরণ শোষণ ও উৎপীড়নমূলক সন্দেহ নাই। তাহারা মজুর -শ্রমিককে খাটাইয়া নির্দিষ্ট কাজ তিল তিল করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া লয় , অথচ শ্রমিকদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ মজুরি আদৌ দেয় না। আর দিলেও নানা কৌশলে ও ফাঁদ -প্রতারণায় জড়াইয়া উহার অধিকাংশ কাটিয়া -ছাটিয়া রাখিয়া দেয়। তাহার পরও যে সামান্য পরিমাণ বেতন বা মজুরি প্রাপ্য হয় তাহাও যথা সময় আদায় করিতে কুন্ঠিত হয় এবং অফিসের নিয়মতান্ত্রিকতা অভাব - পীড়নে তাহাদিগকে অতিষ্ট করিয়া তোলা হয়। একদিকে গরীব ও মজুরদের শিশু -সন্তান ক্ষুধা -তৃষ্ণায় , দু :সহ-জ্বালায় , শীত- গ্রীষ্মের , রোগ-দু :খের দু :সহ চাপে জর্জরিত হইয়া ওষ্ঠাগত প্রাণ। অপরদিকে আকাশচুম্বি বিরাট প্রাসাদের উপর তলায় বিদ্যুত -পাখার হিমশীতল মলয় -হিল্লোল মজুর -দেহের শোণিত বর্ণের লাল -পানি পানের রুদ্রদর্পিত হুঙ্কার -এখন দিতে পারিব না। এক সপ্তাহ পরে বেতন পাইবে ইত্যাদি।

পুঁজিদার আর মালিকদের এবম্বিধ আচরণ ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অন্যায় -অনাচারমূলক এবং ইহা মজুরদের প্রতি তাহাদের অমানুষিক জুলুম , সন্দেহ নাই। ইসলামের শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী মানবতার এই দু :খ মর্মে মর্মে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। দু :খী মানবতার আহাজারী তাঁহার হৃদয় -মনকে বিষায়িত করিয়া তুলিয়াছিল। ব্যথিতের প্রতি সহানুভূতিই ছিল তাঁহার জীবনের অন্যতম ব্রত। তাই তিনি জলদ -গম্ভীর স্বরে ইরশাদ করিয়াছিলেন :

আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন যে , কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমি কঠিন অভিযোগ উপস্থাপিত করিব -যে ব্যক্তি আমার জন্য কাহাকেও কিছু দান করিবার ওয়াদা করিয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিল , কোন মুক্ত স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করিয়া পুরাপুরি কাজ আদায় করিয়া লইল , কিন্তু তাহার মজুরি দিল না - ইহারাই সেই তিন জন।

অন্য হাদীসে বলা হইয়াছে : “ধনীর সামর্থ থাকা সত্ত্বেও পরের ‘হক’ আদায় করিতে অকারণ বিলম্ব করা জুলুম ”।
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় :আদেশ করিয়াছেন
اُعْطُوْا الاَجِيْرَ اجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ رِيْقُهُ ۔
মজুরকে তাহার ঘাম শুল্ক হওয়ার পূর্বেই মজুরি শোধ করিয়া দাও।

অর্থাৎ মজুরি শোধ করিতে অকারণ কিছুমাত্র বিলম্ব করা সঙ্গত নয়। এই ব্যাপারে কোনরূপ টাল -বাহানা করা এবং কোনরূপ ধোঁকা বা প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া পরিষ্কার জুলুম এবং সকল প্রকার জুলুম শোষণের উৎস চিরতরে বন্ধ করিয়া দেওয়াই ইসলামী হুকুমতের কর্তব্য। এই জন্য রাষ্ট্র যথাযোগ্য আইন রচনা করিয়া পুঁজিদার ও কারখানা মালিককে নির্দিষ্ট সময়ে এবং পুরোপুরিভাবে শ্রমিকের বেতন আদায় করিতে বাধ্য করিতে পারিবে। বর্তমান কালের শ্রমিক -মজুরদের জীবনে দু :খ-দারিদ্রের যে অমানিশা নামিয়াছে , ইসলামী হুকুমতে তাহার চির অবসান হইবে, তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না।

:একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে

اِنَّ رَسُوْلٌ اللهِ نَهى عَنِ اسْتَجَارَةِ اِلاجِيْرِ حَتّٰى يُبَيِنُ لَهُ اَجرُهُ ـ

মজুরের বেতন নির্দিষ্ট না করিয়া তাহাকে কাজে নিযুক্ত করিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার ভাষায় নিষেধ করিয়াছেন। এ যুগের পুঁজিদার ও কারখানা -মালিকগণ গরীব দুস্থ ও দারিদ্র নিপীড়িত মজুরদের প্রতি যে ধোঁকা ও প্রতারণামূলক আচরণ করিয়া থাকে , তাহাদিগকে শোষণ করিবার জন্য নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকে , মজুরি নির্ধারিত না করিয়া তাহাদিগকে কাজ করিতে বাধ্য করিয়া এবং কাজ আদায় করিবার পর সামান্য কিছু দিয়ে তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দেয় -বর্তমান বিপর্যস্ত সমাজে এই ধরণের দুর্নীতি এবং জুলুম -পীড়নের কোনই অন্ত নাই। কিন্তু ইসলামী সমাজে ইহার বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকিতে পারিবে না। সেখানে মজুরির পরিমাণ অজ্ঞাত ও অনির্দিষ্ট রাখিয়া কাজ করা কিংবা করান মাত্রই জায়েয নয় বরং কাজ -কাজের স্বরূপ এবং উহার মজুরি -পূর্বেই সুনির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। মুজরি নির্ধারিত না করিয়া কাজ করিলে সেই ধরনের কাজে যাহা মজুরি সাধারণত দেওয়া হয় , তাহাই আদায় করিতে হইবে। মালিক নিজের ইচ্ছামত মজুরির কোন পরিমাণ নির্ধারিত করিতে পারিবে না -করিলে মজুর বা শ্রমিক তা কবুল করিতে বাধ্য হইবে না। কাজের স্বরূপ অনুসারে মজুরি নির্ধারণের ব্যাপারে প্রয়োজন হইলে ইসলামী হুকুমত সরাসরি হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে এবং এক সুসমঞ্জস্য ও সুবিচারপূর্ণ হার নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার পূর্ণ অধিকার তাহার রহিয়াছে।

শ্রকিকদের অজ্ঞতা ও অসহায়তায় সুযোগ লইয়া শিল্পপতি ও পুঁজিদারগণ তাহাদের উপর যাতে কোনরূপ অত্যাচার করিতে না

পারে কোনরূপ শোষণ পীড়ন করিতে না পারে , ইসলামী রাষ্ট্র তাহার নিখুঁত ব্যবস্থা করিবে।

ইসলামী শিল্প -ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মজুরের অধিকার সম্পর্কে একটি হাদীস সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিতেছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন :

মজুরকে তাহার কাজ হইতে অংশ দান কর। কারণ আল্লাহর মজুরকে বঞ্চিত করা যাইতে পারে না।

এই হাদীসের দৃষ্টিতে প্রমাণিত হইতেছে যে , মজুরের নির্ধারিত বেতন যা মজুরি আদায়ের পরও মূল কারখানায় যাহা মুনাফা হইবে তাহা হইতেও মজুরকে অংশ দিতে হইবে। এই সম্পর্কে ইসলামী অর্থনীতিতে যদিও সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না , কিন্তু তবুও নিম্নলিখিত হাদীসটি এই ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন :

إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به ، وفقد ولى حـره ودخانه ، فلقعـده معه . فليأكل . فإن كـان الطعـام مشـفوها قليلا ، فليضع في يـده منه أكلة أو أكلتين

তোমরা ভৃত্য যদি তোমার অন্ন প্রস্তুত করে এবং তাহা লইয়া তোমার নিকট আসে - যাহা রান্না করিবার সময় আগুনের তাপ এবং ধুম্র তাহাকে অনেক কষ্ট দিয়াছে -তখন তাহাকে তোমার সাথে বসাইয়া খাওয়াইবে। খানা যদি শুষ্ক রান্না হইয়া থাকে , তবে তাহা হইতে তাহার হাতে এক মুঠি বা দুই মুঠি অবশ্যই তুলিয়া দিবে। (মুসলিম)

এই হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে , শ্রমিক শ্রমের সাহায্যে মালিকের কাঁচামাল বা মূলধন খাটাইয়া যাহা উৎপন্ন করিবে , তাহা হইতে তাহাকে নির্দিষ্ট হারে বেতন দেওয়ার পরও আসল মুনাফা হইতে তাহাকে কিছু না কিছু অংশ দিতে হইবে। হাদীসে উল্লিখিত ঘরের বাবুর্চি আর কারখানার শ্রমিকের মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নাই। একজন বাবুর্চি খাদ্য পাকাইবার কাজে যেভাবে মনোযোগ দিতে হয় , দেহ ও চিন্তা শক্তিকে যেভাবে নির্দিষ্ট এক কাজের জন্য নিয়োজিত করিতে হয় , কম-বেশি প্রায় তদ্রুপই কারখানার একজন মজুরকেও খাটিতে হয়। কাজেই এক হাদীস অনুসারে নির্বিশেষে সকল শ্রমিকই কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্য হইতে অংশ পাইতে পারিবে। যে মিলে কাপড় তৈরী হয় , প্রত্যেক

শ্রমিককে তাহার পরিবারবর্গের জন্য বৎসরে এক বা একাধিক বার কাপড় দেওয়া যাইতে পারে। ইহা নির্দিষ্ট বেতনের মধ্যে গণ্য হইবে না। কারণ প্রায়ই দেখা যায়, কোন মিলে শ্রমিক সকাল-সন্ধ্যা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া থানকে থান কাপড় বুনে অথচ তাহার নিজের বা তাহার পরিবারের লোকদের পরিধানে হয়ত ছিন্নবস্ত্রটুকুরও অস্তিত্ব নাই। এই হাদীস অনুসারে ইসলামী সামাজে যে শ্রমনীতি কায়েম করা হইবে তাহাতে এই অবাঞ্চিত পরিস্থিতির অবকাশ থাকিতে পারিবে না। খাদ্য প্রস্তুতকারী পাচকের অভুক্ত থাকা যে ইসলাম বরদাশত করিতে পারে না, কারণ খাদ্য প্রস্তুত করিবার ব্যাপারে মালিক শুধু দ্রব্যসামগ্রী দিয়াই রেহাই পাইয়া যায়, কিন্তু উহা প্রস্তুত করিতে গিয়া আগুনের উত্তাপ ও ধোঁয়ার জ্বালা পাচককেই ভুগিতে হয়। তাহা হইলে যে কারখানায় মজুর শ্রমিকগণ প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিয়া হাজার হাজার থান কাপড় বুনল, সে বা তাহার পরিবারবর্গ কাপড়ের অভাবে উলঙ্গ থাকিবে, আর ওদিকে কারখানা-মালিক তাহার কুকুরকে পর্যন্ত মখমলে মূল্যবান বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে, এমন অবিচার ও অসাম্য ব্যবস্থা ইসলাম কিছুতেই সমর্থন করিতে পারে না। একথা প্রমাণ করিতে খুব বেশি যুক্তির আবশ্যক করে না।

ইসলাম মজুর-শ্রমিকদের এই সব অধিকারের কথা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে আরও কয়েকটি হাদীস পাওয়া যায়, যেসবের উপর ভিত্তি করিয়া আধুনিক সমস্যা ও প্রয়োজন অনুপাতে এই সম্পর্কীয় একটি পরিপূর্ণ ও বিস্তারিত বিধান রচনা করা যাইতে পারে। সম্প্রতি আমাদের বক্তব্য শুধু এতটুকু যে, বর্তমান সময় মজুর-শ্রমিকদের এই আকাশ ছোঁয়া জটিল সমস্যাসমূহের সুষ্ঠু ও সুবিচারপূর্ণ সমাধান করিতে পারে একমাত্র ইসলাম। মালিক-মজুরের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও শ্রেণী সংগ্রাম অতি সহজেই বন্ধ হইতে পারে? তিক্ততার পরিবর্তে তথায় মধুর সহযোগিতা ও সহানুভূতিমূলক সম্পর্কের সৃষ্টি হইতে পারে। অতএব অনতিবিলম্বে ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করা এবং ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী মালিক ও মজুরের যাবতীয় সমস্যা সমাধান করা একান্তই কর্তব্য। আর সেই জন্য সরকার ও কারখানা মালিকগণের তথা সমগ্র দেশবাসীরই প্রাণপণ চেষ্টা করা বাঞ্চনীয়।

(প্রবন্ধটি ১৯৫১ সালের ৫ই জুলাই ঈদ সংখ্যা দৈনিক ‘আজাদে’ প্রকাশিত হয়)

নবতর শ্রমিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও ভিত্তি

এই সব কারণেই বাংলাদেশে এমন এক মজুর আন্দোলন গড়িয়া তোলা আবশ্যক যাহা একদিকে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা হিসাবে দেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইবে। অপর দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মজুর শ্রমিকদের উপস্থিত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিবে- তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও স্বার্থ আদায়ের জন্য ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা সহকারে আন্দোলন চালাইবে। এইরূপ এক পূর্ণাঙ্গ মজুর আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য নিম্নোক্ত পাঁচটি ভিত্তি একান্তই জরুরী।

১. সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও পরিকল্পনা
২. সমাজ-সংস্কার শ্রমজীবীদের সম্মানজনক স্থান নির্ধারণের ব্যাপারে পূর্ণ দৃষ্টি ও সচেতনতা
৩. শ্রম ও পুঁজির পারস্পরিক সম্পর্ক, অধিকার ও কর্তব্য
৪. শিল্পগত সম্পর্ক ও সম্বন্ধের রীতিনীতি
৫. শ্রমের কারণ ও উদ্বোধক

পূর্ববর্তী প্রবন্ধ হইতে একথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, যে উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ে ইসলাম এক অত্যন্ত ব্যাপক এবং কল্যাণকর মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত করিয়াছে। ইসলামের একটি নিজস্ব সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা রহিয়াছে। রাষ্ট্র সম্পর্কে উহার এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ ও পরিকল্পনা রহিয়াছে।

ইসলামী আদর্শে গঠিত সমাজের শ্রমিকদের মর্যাদা ও অধিকার কোন দিক দিয়াই হীন নহে, হেয় ও ঘৃণার্হ নহে। বরং হালাল রিযিক লাভের জন্য যে কোন প্রকারের শ্রম-দৈনিক কিংবা মানসিক-সবই ইবাদত এবং আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম উপায়।

এই কারণে ইসলামী সমাজে শিল্পগত সম্পর্কে ঠিক মানবীয় ধারায় স্থাপিত হইতে বাধ্য। শ্রমজীবিরাও মানুষ, অতএব ‘হক্কুল ইবাদ’ এর ইসলামী ধারণার ভিত্তিতেই মালিকদের হক এর মুকাবিলায় শ্রমজীবীদের ‘হক’ ও নির্ধারিত হইবে-ইহাতে সংঘর্ষের অবকাশ নেই বললেও চলে।

বর্তমান শ্রমিক অশান্তির কারণ অনেক ক্ষেত্রে নিতান্ত মনস্তাত্বিক। এই মনস্তাত্বিক কারণ যতদিন বর্তমান থাকিবে শ্রমিক অশান্তি প্রশমনের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

আধুনিক শিল্প-নীতিতে পুঁজির মুকাবিলায় শ্রমের মূল্য কম, মর্যাদা আরো হীন। ইহার দরুন শ্রমিক অশান্তি যে অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কমিউনিজম শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু উহা কিতাবের পৃষ্ঠা হইতে নামিয়া বাস্তবক্ষেত্রে যখনই কার্যকর হইতে শুরু করিয়াছে, তখনই দুনিয়ার মানুষ দেখিতে পাইয়াছে যে, ‘মজদুর রাজ’ এর নামে সেখানে এক বিশেষ কর্তা-শ্রেণীর নিরংকুশ ও সর্বাত্মক ডিকটেটরী শাসন কায়েম হইয়া শ্রমিকদের আষ্ঠেপৃষ্ঠে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে সেখানে শ্রমিক অসন্তোষ তুষের আগুনের মতো জ্বলিয়া সমাজ সংস্থাকে তিলে তিলে দগ্ধ করিয়াছে।

বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলন

ইসলামের শ্রমিক-মজুরদের জন্য যে সব অধিকার নির্ধারিত হইয়াছে, তদৃষ্টে এইকথা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে যে, ইসলামী সমাজে মজুরদের কোন প্রকৃত সমস্যাই অসমাপ্ত থাকিয়া যাইতে পারে না। শুধু সমাধান তাহাই নয়, শ্রমিক-মজুরদের যাবতীয় মৌলিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান কেবলমাত্র ইসলামী আদর্শে গঠিত সমাজেই সম্ভব।

ইসলাম আদর্শ মজুর-শ্রমিকদের যাবতীয় সমস্যার যেভাবে সামাধান করে, তাহা কোন বিছিন্ন ও স্বতন্ত্র জিনিস নহে। এমন জিনিস নহে যে, উহার সাহায্য নিরপেক্ষভাবে কেবলমাত্র মজুরদের সমস্যারই সমাধান করা সম্ভব হইতে পারে। বরং তাহা ইসলামের পূর্ণাঙ্গ সমাজ ব্যবস্থার এক অপরিহার্য অংশ, পূর্ণমাত্রায় গঠিত ইসলামী সমাজেই-যেখানেই ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে মানুষের সামগ্রিক সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে, কেবলমাত্র সেখানেই-এই সমস্যার সমাধান পূর্ণমাত্রায় কার্যকরী করা সম্ভব নয়। ইসলামী আদর্শে গঠিত নয় এমন সমাজে মজুর সমস্যার ইসলামী সমাধান কার্যকর হওয়ার কোনই সম্ভবনা থাকিতে পারে না। এই কারণে যাহারাই ইসলামী আদর্শে মজুর সমস্যার সমাধান করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে সোজা-সুজি ও কেবলমাত্র মজুর সমস্যার সমাধানের জন্য নহে; বরং ইসলামী আদর্শে এক পূর্ণাঙ্গ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগী হইতে হইবে। ইসলামী আদর্শ বিরোধী সমাজে মজুরদের সমস্যার ইসলামী সমাধান লাভ করিতে চাওয়া মরুভূমির বুকে ঝর্ণা প্রবাহের কামনা করিবার সমতুল্য।

শ্রমিক ও সমাজ

বস্তুত মজুর শ্রমিক একটি গোটা সমাজের অঙ্গ বিধায় সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজের যাহা আদর্শ মজুর সমস্যার সমাধানেরও সেই আদর্শই কার্যকরী হইতে পারে। আর সমাজ যদি পুঁজিবাদী হয়, মজুর শ্রমিকরাও পুঁজিবাদী আদর্শেই নিজেদের সমস্যাবলীর সমাধান পাইতে পারে; আর সমাজ যেখানে সমাজতন্ত্রী, মজুর শ্রমিকগণও সেখানে গোটা সমাজের ন্যায় সামগ্রিকতাবাদের (Totalitarianism) শৃংখলে বন্দী হইয়া থাকিতে বাধ্য। অনুরূপভাবে মজুর-শ্রমিকদের ইসলাম প্রদত্ত অধিকার ও মর্যাদা কেবলমাত্র ইসলামী সমাজেই বাস্তবায়িত হইতে পারে। কাজেই শ্রমিক-মজুরদের সমস্যার ইসলামী সামাধানকে কার্যকরী করিবার জন্য ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গোটা সমাজকে গঠন করাই প্রাথমিক কাজ। সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে একবিন্দু ধারণাও যাহাদের আছে, তাহারা এই কথার যথার্থতা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। অতএব ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন মজুর সমস্যার ইসলামী সমাধান কার্যকরী করা সম্পর্কে নিরপেক্ষতা বা নিরবতা ও ঔদাসিন্যতা অবলম্বন করিতে পারে না। পক্ষান্তরে মজুর সমস্যার ইসলামী সমাধান কার্যকরী করণের জন্য যে আন্দোলন তাও মূলগতভাবে ইসলামী সমাজ গঠনের আন্দোলন তাহাকে মৌলিক নীতি প্রকৃতির দিক দিয়া অবশ্যই ইসলামী আন্দোলন হইতে হইবে এবং গোটা ইসলামী আন্দোলনকে ও শ্রমিক-মজুরদের সমস্যাবলীকে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সমাধান করিবার জন্য পূর্ণমাত্রায় দায়িত্বশীল হইতে হইবে।

শ্রমিক আন্দোলন

বাংলাদেশে যদিও ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হইতে যাইতেছে এবং সেখানে পূর্ণমাত্রায় ইসলামী সমাজ গঠনের জন্য প্রবল ও বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় আন্দোলন চলিতেছে; কিন্তু এখানে মজুর সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্য যে আন্দোলন চালিতেছে তাহা ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক নহে এবং তাহা ইসলামের নির্ধারিত পথে পরিচালিত হইতেছে বলিয়াও দাবি করা চলে না। ইহার কারণ প্রধানত এই যে, বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলন বৃটিশ ভারতের শ্রমিক আন্দোলনেরই উত্তরাধিকার মাত্র।

পাক ভারতের শ্রমিক আন্দোলন প্রথম মহাযুদ্ধের পর এক স্বতন্ত্র শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারত বিভাগ পর্যন্ত ইহা এক নিজস্ব ও নির্ধারিত রূপ পরিগ্রহ করে। ভারত বিভাগের পর অতি স্বাভাবিকভাবেই মজুর আন্দোলনও বিভক্ত হইয়া এদেশে অনুপ্রবেশ করে। পূর্বেই এই আন্দোলন যে ধরনের নেতৃত্বে এবং যে ধারা-প্রকৃতিতে পরিচালিত হইত এদেশেও ঠিক অনুরূপ নেতৃত্বেও ধারা-প্রকৃতিতে পরিচালিত হইতে শুরু করে। তাই বলা যায়, বিভাগ পূর্ব মজুর আন্দোলন ও বিভাগোত্তর শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে রীতি-নীতি ও ধারা-প্রকৃতির দিক দিয়া কোনোই পার্থক্য নাই। আর এই কারণেই এদেশে জনগণের আদর্শিক ভিত্তির সহিত এখানকার শ্রমিক আন্দোলনের কোন সামঞ্জস্য বা ঐক্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অতএব এইখানে ইসলামী ধারা- প্রকৃতির অনুরূপ এক শ্রমিক আন্দোলন গড়িয়া তোলা একান্তই আবশ্যক।

দেশের বর্তমান শ্রমিক-নেতৃত্ব বৃটিশ ভারতের উত্তরাধিকারী হওয়া এবং এখানকার সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামো ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত না হওয়ার কারণে এদেশের জনগণের আদর্শিক চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে এখানকার শ্রমিক আন্দোলনের ধারা- প্রকৃতিতে কোনরূপ পরিবর্তন সূচিত করিবার প্রয়োজন বোধ হয় নাই। পূর্বে এ আন্দোলন যেমন চলিত সম্পূর্ণ সেকিউলারিস্ট ধারায় ও দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং উহার পরিণামে সৃষ্টি হইত মালিক ও শ্রমিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ; ঠিক তেমনি বর্তমান শ্রমিক আন্দোলনেও এই শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ ছাড়া অন্য কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। উপরোন্তু এখানকার নেতৃত্বে মজুরদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার স্বার্থোদ্ধারের ব্যাপারেও পূর্ণ নিষ্ঠাবান বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে নাই। এদেশে এইরূপ নেতৃত্ব বিরল নহে, যাহারা মজুর-শ্রমিকদের নির্দিষ্ট দাবির ভিত্তিতে ধর্মঘট করিতে বাধ্য নিজেদের মালিক পক্ষের সহিত গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং কিছু দিনের মধ্যেই মালিকদের নিকট হইতে বিপুল পরিমাণ অর্থ গ্রহণের বিনিময়ে ধর্মঘট প্রত্যাহারের ঘোষণা প্রচার করে। ফলে মজুরদের স্বার্থ বিনষ্ট হয়, আর মাঝখান দিয়া তাহাদের নেতৃত্ব বিপুল অর্থ লুটিয়া লয়। মজুরদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ বলি দিয়া অন্যায় স্বার্থ উদ্ধার করিয়া লয়। এইরূপ মজুর-নেতা এদেশে যথেষ্ট সংখ্যক বিরাজ করিতেছে বলিয়া মজুরদের কোন সমস্যারই একবিন্দু সমাধান লাভ আজও সম্ভব হইল না।

তাই এই কথায় কোনই সন্দেহ থাকেনা যে, দেশের বর্তমান শ্রমিক আন্দোলন আদর্শিকতার দিক দিয়া যেমন এখানকার জনগণের চিন্তা- বিশ্বাসের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, তেমনই তাহা মজুর-শ্রমিকদের অধিকার ও ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ আদায়েরও অনুকূল নহে। মজুরদের বর্তমান নেতৃত্ব কোন দিনই প্রকৃত সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টিত হইবে না, বরং উহাকে যথাযথভাবে জিয়ায়ে রাখিতেই সযত্নে চেষ্টা চালাইতে থাকিবে। কেননা সমস্যার সমাধানই যদি হইয়া যায় তাহা হইলে শ্রমিক আন্দোলনেরও প্রয়োজন থাকিবে না, আর তাহাদের নেতৃত্বের আবশ্যকতাও ফুরাইয়া যাইবে।

শ্রমের উদ্বোধক

ইসলামী সমাজে শ্রমের উদ্বোধক স্বার্থ, লোভ বা বিলাস উপকরণ সঞ্চয় প্রবণতা নয়; বরং তা হচ্ছে জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য লাভ, আল্লাহ ও রাসূলের সন্তোষ বিধান এবং ইহকাল ও পরকালের সর্বোচ্চ কল্যাণের অধিকারী হওয়ার উদ্দীপনা।

কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান শ্রমিক আন্দোলনে উপরোক্ত পঞ্চ ভিত্তিকে উপেক্ষা করা হইয়াছে। ফলে এখানকার শ্রমিক আন্দোলন যেমন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে তেমনি ইহার নেতৃত্বও চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। আন্দোলনের দুর্বলতা ও নেতৃত্বের ব্যর্থতার অন্য সব কারণের মধ্যে শিল্পপতি ও মালিক পক্ষের ভুল আচরণ ও সরকারী লেবার ডিপার্টমেন্টের মজুরধ্বংসী নীতিকে প্রধানত দায়ী করা হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং মজুর নেতৃত্বের বন্ধ্যাত্ব যে অন্যতম কারণ তাহা স্বীকার করিতে দ্বিধা-সংকোচ করা হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, উপরোক্ত পঞ্চ ভিত্তিকে স্থায়ী বুনিয়াদ হিসাবে গ্রহণ করিয়া শ্রমিক আন্দোলন গঠন করা না হইলে-না আন্দোলন জোরদার হইতে পারে আর না পারে উহার নেতৃত্ব কিছুমাত্র বলিষ্ঠ হইতে। এই কথা যতশীঘ্র স্বীকার করা হইবে শ্রমিক আন্দোলনের স্বার্থকতা ততই নিশ্চিত ও আসন্ন হইবে।

ইসলামী আদর্শে মজুর আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইলে প্রথমত সাধারণভাবে সমগ্র শ্রমজীবি এবং বিশেষভাবে তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এই চেতনা জাগ্রত করিতে হইবে যে, দেশে সামগ্রিকভাবে ইসলামী সমাজ গঠনই হইতেছে তাহাদের যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের সঠিক ব্যবস্থা।

অতপর এই প্রেক্ষিতেই শ্রমিক আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে। বস্তুত সমগ্র দেশে যদি ইসলামী শিক্ষা, নৈতিকতা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহা হইলে সাধারণ লোকদের ন্যায় মজুর-শ্রমিকরাও মনস্তাত্বিক অশান্তি এবং নৈতিক ও অর্থনৈতিক দূর্নীতি ও শোষণ-অপমান হইতেও স্থায়ীভাবে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। এই কারণে শ্রমিক আন্দোলনের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা ইহাই হইতে হইবে।

ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে এক আদর্শিক শিক্ষা ব্যবস্থা রচনা করাও আবশ্যক। কেননা নিজস্ব শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা ব্যতীত কোন আদর্শ ভিত্তিক আন্দোলনই সফল লাভ করিতে পারে না। ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যাহার সাহায্যে শ্রমজীবীরা ধীরে ধীরে ও অত্যন্ত কার্যকর ভাবে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার অনুকূলে এক জীবন্ত সার্থক শক্তি হিসাবে গড়িয়া উঠিবে। শ্রমিক আন্দোলনের সাধারণ টেকনিকও এই উদ্দেশ্যের অনুকূলে গ্রহণ করা হইবে।

এই দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচীর একটি বিশেষ অংশ হিসাবে সাধারণ মজুর-শ্রমিকদের মধ্যে ইসলামী জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক চেতনা ও জ্ঞান এবং সেইজন্য এক উদগ্র পিপাসা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। তাহাদের এমনভাবে ট্রেনিং দিতে হইবে যেন তাহারা ইসলামী সমাজ গঠন ও রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী ব্যক্তি বা দলের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করে।

স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা

স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা হিসাবে মজুরগণ যাহাতে দেশের উন্নয়নমূলক কাজে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারে, মজুর আন্দোলনকে সেইজন্য যত্নবান হইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বর্তমান শ্রমিক আইন এর পরিবর্তন ও সংশোধন সূচিত করা, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, কাজের সময়ের পরিমাণ হ্রাস, সাধারণ জীবন যাপনের মান উন্নয়ন, শ্রমিকদের শিশু সন্তানের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সংরক্ষণের পুর্ণ ব্যবস্থা করণ এবং সেই সঙ্গে মজুর সংগঠনের এবং সভা-সম্মেলন অনুষ্ঠানের অবাধ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নিয়মতান্ত্রিক চেষ্টা চালাতে হইবে। মজলুমের সাহায্য ও জুলুম প্রতিরোধের জন্য বীর দর্পে আগাইয়া আসিতে হইবে। সেইজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। প্রত্যেক শ্রমজীবী যাহাতে মানুষের মর্যাদা ও অধিকার

পাইয়া জীবন যাপন করিতে পারে, সেইদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আর গোটা আন্দোলনকে এমন প্রকৃতিতে গড়িয়া তুলিতে ও চালাইতে হইবে যে, উহাতে যাবতীয় দাবি দাওয়াকে সংঘর্ষের পরিবর্তে একই সমাজের দুইটি শ্রেণীর পারস্পরিক বিরোধ নিষ্পোত্তির পর্যায়ে রাখিয়া সকল দাবি-দাওয়া আদায় ও সকল সমস্যার সমাধানের সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পথ উন্মুক্ত হইবে।

এক্ষণেই এইরূপ এক নবতর আদর্শবাদী শ্রমিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করা যাইতেছে। বর্তমান শ্রমিক ইউনিয়নসমূহের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ শ্রমজীবিগণের আশু দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।

সমাপ্ত